প্রথম আলো

তারিখ ... 07 NOV 2013
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ২

শিশু-কিশোর ■ রেজিনা আখতার

প্রতিটি বিদ্যালয়ে চাই গ্রন্থাগার

শিশুদের জন্য আয়োজিত এক কর্মশালার সাক্ষাৎকার পর্ব চলছে। মোট ১৫৩ জন প্রতিযোগী, বয়স ১২ থেকে ১৬। সবাই খুব সিরিয়াস। যে করেই হোক, এই বৈতরণী পার হতেই হবে। অবশ্য ওদের চেয়ে মায়েদের দুশ্চিন্তাই বেশি। কর্মশালার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিশু-কিশোরদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা। ১৫৩ জন শিশু-কিশোরের মধ্যে দুজন বাদে বাকিরা পাঠ্যবইয়ের বাইরে কোন বইটি সর্বশেষ পড়েছে বা কবে পড়েছে মনে করতে পারেনি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য সম্পর্কে অধিকাংশেরই কোনো ধারণা নেই। সবারই প্রিয় লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। কিন্তু প্রিয় লেখকের বইয়ের নাম তারা বলতে পারেনি।

জাতি হিসেবে আমাদের রয়েছে অনেক সুমহান অর্জন, রয়েছে গর্ব করার মতো বহু সাফল্য। মেধা ও মননে আমরা কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে আমাদের ঘাটতি রয়েছে, রয়েছে পরিপক্বতার অভাবও। একটা সময় ছিল উৎসবে উপহার হিসেবে বইয়ের কদর ছিল সবচেয়ে বেশি। মধ্যবিত্ত পরিবারে এক আলমারি বই ড্রয়িং রুমের শোভা বর্ধন করত। মা-বাবারাও কোনো উৎসব অথবা জন্মদিনে তাঁদের সন্তানদের বই উপহার দিতেন। এতে করে ছোটবেলা থেকেই শিশুরা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়ার ব্যাপারেও আগ্রহী হয়ে উঠত। এখন আর তেমনটি চোখে পড়ে না। তার জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে নতুন নতুন ডিজাইনের মোবাইল ফোন, আইপ্যাড, ল্যাপটপ, নিনটেনডো, প্লে-স্টেশনসহ আরও অনেক কিছু। তারা যেহেতু খেলা মাঠে গিয়ে খেলতে পারছে না, তাদের জন্য যথার্থ বিনোদনের ব্যবস্থা নেই। সেহেতু ইলেকট্রনিকস ডিভাইসের মধ্যেই তারা খুঁজে নিচ্ছে আনন্দ। ভার্চুয়াল বন্ধুত্ব আর ভার্চুয়াল জগতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে কোমলমতি শিশু-কিশোরেরা। ফলে শৈশব থেকেই তারা যন্ত্রে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে তাদের সংবেদনশীলতা, সহমর্মিতা ও সহনশীলতা। কী ভয়াবহ এক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

উন্নত বিশ্বে গেলে দেখা যায়, ট্রেনে, বাসে, স্টেশনে যেখানেই সময় পাচ্ছে, বই পড়ছে তারা। বড় বড় শপিং মলে নানা রকম শোরুমের পাশাপাশি বইয়েরও মনকাড়া শোরুম থাকে। অথচ আমাদের দেশে যাও দু-একটা ছিল, তা-ও যেন ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। ঢাকার শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটের বইয়ের দোকানগুলো এখন প্রায় অতীত। বেশির ভাগই এখন জামাকাপড়ের দোকানে পরিণত হয়েছে। আমরা পড়ার অভ্যাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের উন্নয়ন ভাবনায় শুধু বড় বড় শপিং মল, নতুন নতুন টিভি চ্যানেল বা দাদানকোঠা! ক্রমাগত জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ উন্নত হয় এবং তার চিন্তাশক্তিকে শাণিত করে।

শিশু-কিশোরদের পাঠাভ্যাস কমে যাওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণ হলো অভিভাবকেরা। পাঠ্যবইয়ের বাইরে কোনো বই-ই তাঁরা সন্তানকে পড়তে দিতে রাজি নন। ৫০০ টাকা দিয়ে ফাইভ্রুড কিনে দিতে কোনো আপত্তি না থাকলেও বই কেনার ব্যাপারে রয়েছে প্রবল আপত্তি! পড়াশোনার ক্ষতির দোহাই দিয়ে বই কেনা থেকে নিবৃত্ত করা হয় সন্তানকে। বহু শিক্ষকও আছেন, যাঁরা পাঠ্যবই-বহির্ভূত বই পড়াকে সমর্থন করেন না। এ ছাড়া রয়েছে যথাযথ পাঠসামগ্রীর অভাব ও দেশি বইয়ের অপর্যাপ্ত মান। বিদেশি ভালো বইয়ের অতিরিক্ত দামের ফলে সেটাও ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। গ্রন্থাগারসমূহের জন্য অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ হতাশারই উদ্রেক করে মাত্র। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহের কারণে প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতি আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। শিশু সাহিত্যিকের স্বল্পতার পাশাপাশি শিশু সাহিত্য সম্পর্কেও রয়েছে যথাযথ ধারণার অভাব। প্রকাশনা শিল্পের নানা রকম সীমাবদ্ধতা এবং কাগজের ক্রমেই মূল্যবৃদ্ধিসহ আরও অন্যান্য কারণেই পাঠাভ্যাস কমে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার জন্য দরকার ছোটবেলায়ই বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। পরিবারকে সবার আগে সচেতন হতে হবে, বিশেষত মাকে। কারণ, পরিবারই হচ্ছে শিশুর প্রথম বিশ্ব তথা শিক্ষালয়ও বটে এবং মা হচ্ছেন তার কেন্দ্রবিন্দু। গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণত দুই বছর বয়স থেকেই শিশুরা রংচঙে ছবির বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, যাতে মানুষ, পশুপাখি, বাড়ির নানা রকম আসবাবের ছবি আছে, তা দেখে শিশু ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদিও এই বয়সের শিশুর পড়ার প্রশ্ন আসে না, তবু অন্যের পড়ার সুর শুনতে এবং পাঠরত মানুষের মুখের ভাবভঙ্গি উপভোগ করতে ভালোবাসে। অর্থাৎ তখন থেকেই পাঠের প্রতি তার একটা ভালোবাসা জন্ম নেয়। কিন্তু আমাদের বড়দের কারণেই ক্রমে ক্রমে তা হারিয়ে যায়।

এ ছাড়া শিক্ষকদেরও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্য বই পড়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা যায়। এ লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা; কুল ম্যাগাজিন, দেয়াল পত্রিকা প্রকাশনা; তাতে বিভিন্ন প্রকারের রচনা প্রকাশের মাধ্যমে প্রকারান্তরে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তা প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে।

প্রতিটি স্কুলে যদি গ্রন্থাগার স্থাপন এবং বই ইস্যু বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়, তাহলে অভ্যাসটা তৈরি হবে শুরু থেকেই। একজন শিশুকে যদি বছরে অন্তত ৪০-৫০টা বই পড়ানো যায়, তাহলে বইয়ের বিশাল জ্ঞানভান্ডারের সঙ্গে তার একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে যদি গ্রন্থাগার এবং একজন যোগ্য গ্রন্থাগারিক থাকেন, তবে শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

পাশাপাশি পাঠ্যসামগ্রীরও মান উন্নয়ন করতে হবে, বই পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহায়তায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাড়াতে হবে। শিশুদের উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু করে তোলে—এমন সব কর্মসূচি নিতে হবে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ভাবেই। প্রতিযোগিতামূলক এই বিশ্বে টিকে থাকতে হলে জ্ঞান, তথ্য ও সৃজনশীলতার সমন্বয় দরকার। উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কীভাবে পাঠাভ্যাস বাড়ানো যায়, তা নিয়ে ভাবতে হবে সবাইকে।

● রেজিনা আখতার : প্রধান গ্রন্থাগারিক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী।